সুশাসন, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক উত্তরণ ও তাজউদ্দীন আহমদ

১। অবতরণিকাঃ

মানবিক বোধের ও gbyl¨‡Zj¡i সুউচ্চ বেদীতে দাঁড়িয়ে যিনি মানুষের gh©v`v ও মানবিক সম্ভাবনার বাণী ঘোষণা করে গেছেন; যিনি রাজনীতিতে সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা, যোগ্যতা ও অসম্প্রদায়িকতাকে মূখ্য বলে জেনেছেন; তিনি তাজউদ্দীন আহমদ। বাংলার আকাশে এই উজ্জ্বল নক্ষত্রের আলোতে বাঙালি খুঁজে নিয়েছিলো তার স্বাধীনতার m~h©‡K। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ব, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রধান সহযোগী হিসেবে জাতীয় নীতি ও রাজনৈতিক পরিকল্পনা প্রনয়ণে হয়ে ওঠেন প্রধান ব্যক্তি। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বাংলাদেশের প্রথম সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে অসাধারণ গৌরবদীপ্ত নেতৃত্বদান ও বিজয় অর্জনের সাফল্য। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনিই একমাত্র নেতা যার সম্পর্কে প্রশংসা ছাড়া নেতিবাচক কথা শোনা যায় না। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত পরিছন্ন ও উন্নত চেতনাসম্পন্ন। বাংলাদেশের আর্থ-সমাজিক ও রাজনৈতিক উত্তরণে তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা

উল্লেখযোগ্য। সুশাসন ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে তিনি ছিলেন অনুকরণীয়। তাঁর অসাধারন জীবনবোধ এবং রাজনৈতিক দক্ষতার মধ্যদিয়ে তিনি হয়ে ওঠেন চিরকালের, চির বর্তমানের। সুখী সমাজ ও আত্মপ্রত্যয়ী বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন এ দেশের মানুষ প্রাণের গভীরে লালন করে - সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথ তিনি যেন নির্দেশ করে গেছেন তাঁর চিন্তায়, তাঁর কাজে, তাঁর উচ্চারিত শব্দে, তাঁর জীবনবোধে।

২। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তরণে তাজউদ্দীন আহমদ

তাজউদ্দীন আহমদ ১৯২৫ সালের ২৩ জুলাই ঢাকার অদূরে গাজীপুরের কাপাসিয়ায় জন্মগ্রহন করেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে অসাধারণ ফলাফল AR©b করে স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়েছেন তিনি । ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৪৮ সালে আই.এ এবং ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন তাজউদ্দীন আহমদ

। পরবর্তীকালে ১৯৬৪ সালে কারাবন্দী অবস্থায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তিনি আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী লাভ করেন।[1] তবে পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডি ছেড়ে জনতার গণ্ডি ছিল তাঁর মূল আকর্ষণ। তাই রাজনীতি ছিল তাঁর মূল ভাবনাজুড়ে। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের মূলে স্থান পায় সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক মুক্তি এবং কুসংস্কারমুক্ত, অসম্প্রদায়িক, শোষণহীন উদার একটি সমাজ-ব্যবস্থা-সর্বোপরি একটি বিশুদ্ধ গণতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামো নির্মাণ করা।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তরণে তাজউদ্দীন আহমদের ভূমিকা Acwinvh©। তাঁর রাজনৈতিক কর্মময়তার মধ্যদিয়ে খুঁজে পাওয়া যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক উত্তরণের ইতিহাস। ১৯৪৩ সালে তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গীয় মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৪৪ সালে তিনি মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রগতিশীল আদর্শে শিক্ষিত হওয়া m‡Ë¡। মুসলিম লীগের মত একটি পশ্চাদপদ ভাবাদর্শ সম্পন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে তার যুক্ত হওয়ার কারণ ছিল- মুসলীম লীগকে আহসান মঞ্জিল থেকে

১ জি. এম. তারিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জুলাই ২০০৯ইং।

বের করে এনে সাধারণ মানুষের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।[2] একই সঙ্গে মুসলীম লীগকে আজাদ পত্রিকা ভিত্তিক প্রচারের কবল থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন তিনি। মুসলীম লীগকে পুঁজিপতিদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি সদস্যদের নিকট থেকে চাঁদা আদায়ের জন্য কাজ করেন।[3] রাজনৈতিক জীবনকালে ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত কৌশলগত কারণে তিনি মুসলিম লীগের ব্যানারে থেকে একজন প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মী ও নিবেদিত প্রাণ সংগঠক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলেন।[4]

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে ভাষার অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী যতো আন্দোলন হয়েছে তাজউদ্দীন আহমদ তার প্রতিটিতেই নিজ চিন্তা ও কর্মের স্বাক্ষর রেখেছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তাজউদ্দীন ছিলেন সোচ্চার কন্ঠ। ১৯৪৮-এর ১১ এবং ১৩ মার্চ সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে

---

[2] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর(অংকুর প্রকাশনী, ২০০৮)।

[3] কামরুদ্দীন আহমেদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি (ঢাকাঃ ইনসাইড লাইব্রেরী, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা ১৮।

[4] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ২৮।

ধর্মঘট-কর্মসূচি ও বৈঠক করেন। তিনি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন।

তিনি ১৯৫৩ সালে যুক্ত হন মূলধারার রাজনীতিতে। ১৯৫৪ সালে মাত্র ২৯ বছর বয়সে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিয়েই তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ফকির আবদুল মান্নানকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে এমএলএ নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনের পরবর্তিতে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, আওয়ামী লীগের পুনঃজীবন, ৬ দফা প্রনয়ণ, ৬ দফা ভিত্তিক আন্দোলন পরিচালনা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি মৌলিক ও প্রায় নীতিনির্ধারণের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। তৎকালীন সার্বিক পরিস্থিতি বিচার করে বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' দলীয় সিদ্ধান্তেই তাজউদ্দীনের মতো মেধাবী দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতার হাতেই রচিত হয়েছিল।

রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সদা জাগ্রত ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। ১৯৪৬, ১৯৫০, ১৯৬৪ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় একজন অসম্প্রদায়িক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি অসহায় ও বিপদাপন্ন সম্প্রদায়কে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতেন।

সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নেই তিনি প্রথমে মুসলীম ছাত্রলীগ ও আওয়ামী মুসলীম লীগ এ যোগদান করেননি বরং একটি অসম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ধারার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আওয়ামী মুসলীম লীগ অসম্প্রদায়িক সংগঠনে পরিণত হওয়ার পরেই কেবল তিনি এতে যোগদান করেন।

পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প সময়ের মধ্যে তিনি উপলব্ধি করেন যে, পাকিস্তান অর্জনে পূর্ব-বাংলার মানুষের স্বাধীনতা আসেনি [5] এবং পাকিস্তান কাঠামোতে এখানকার মানুষের আর্থিক লাভ কোনভাবেই সম্ভব নয়।

বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম। বাঙালির এই মুক্তি সংগ্রামে যাঁর অমিত সাহসী নেতৃত্বে ও প্রগাঢ় দেশপ্রেমের মহিমায় নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছিল সমগ্র জাতি; সেই মহান দেশপ্রেমিক হলেন তাজউদ্দীন আহমদ।[6] মুক্তিযুদ্ধের সাফল্যের পশ্চাতে তাঁর কৌশলগত চিন্তা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার খুব বড় ভূমিকা ছিলো। পকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর সাথে লড়াই করার জন্য দরকার ছিল মুক্তিযোদ্ধা প্রশিক্ষণ,

[5] তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি, ২৯ মার্চ, ১৯৪৮।

[6] সুকান্ত পার্থিব, চাঁদের আলোয় ঢাকা সূর্যালোক তাজউদ্দীন আহমদ, available at http://blog.bdnews24.com/Sukanta/28030 accessed on 15 June, 2012

অস্ত্র, গোলা-বারুদ। এসব কিছুর ব্যবস্থা করাও সহজ ছিলো না।[7] কিন্তু তিনি সবকিছু মোকাবিলা করেছেন দক্ষতার সাথে। বিশ্ব রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়ের সাথে সমন্বয় সাধন এবং নতুন জন্ম নেয়া বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতাও চালিয়ে যান তাজউদ্দীন। এমনিভাবে যুদ্ধের সময়ে কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে, কখনও শরণার্থী শিবিরে, কখনো ভারতীয় মন্ত্রীদের সাথে বৈঠক করে আবার কখনও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সংগ্রামী শিল্পীদের সাথে নিয়ে তাঁর যুদ্ধের প্রতিটি দিন কাটতে থাকে।[8]

পুরো ১৯৭১ সাল জুড়ে তিনি পরিবারের সঙ্গ ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর ভাবনা ছিল, গোটা দেশ যখন সার্বক্ষণিক যুদ্ধে লিপ্ত, দেশের অল্পবয়সী ছেলেরা যখন মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনে মৃত্যুময় যুদ্ধের মুখোমুখি তখন সেই যুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্বে থাকা মানুষটি কীভাবে পারিবারিক জীবনযাপন করতে পারে?[9]

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হলে ২২ ডিসেম্বর তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন এবং কাধে তুলে নেন সদ্য ভূমিষ্ঠ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। যুদ্ধ পরবর্তিতে দেশ গঠন ও

---

[7] মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১ ।

[8] তানভীর মোকাম্মেল, প্রামাণ্যচিত্র, তাজউদ্দিন আহমেদ : নি:সঙ্গ সারথি (২০০৭)।

[9] মুক্তিযুদ্ধ পূর্বাপর কথোপকথন, প্রথমা, ২০০৯।

সমাজকে অস্ত্রমুক্ত করতে জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা নেন তিনি। কিন্তু তা উপেক্ষিত হয়ে রক্ষীবাহিনী গঠন করা হয়। তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুন্যাল কথা বলেছেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক চাপের মুখে অভিযুক্ত ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার ব্যহত হয়। তিনি দালাল আইনে অভিযুক্তদের ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে প্রবল আপত্তি জানান। তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের কোন দেশেই ক্ষমা হয় না। তিনি বিচার করে প্রয়োজনে দন্ড মওকুফ করার কথা বলেন। এটা করা হলে, ইতিহাসে অন্তত লেখা থাকতো মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্ত তার এই মতও উপেক্ষিত হয়।[10]

তিনি অল্প বয়স থেকেই নিয়মিতভাবে ডায়েরি লিখতেন। তাঁর এই গুণাবলি ও ডায়েরির লিপিবদ্ধ বিষয়ে বলা যায় যে তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে উন্নত ব্যতিক্রমী চিন্তা-চেতনার মানুষ। এই ধরণের বৈশিষ্ট্য সমকালীন কোন নেতার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়নি। উন্নয়ন ভাবনার

[10] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৫৪৭

ক্ষেত্রে তিনি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।[11] তবে তাঁর মূল প্রবণতা ছিল উচ্চমাত্রার গণতন্ত্রের প্রতি। তিনি বিশ্বাস করতেন গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র আনা যায়, জোর করে চাপিয়ে দেয়া সমাজতন্ত্র কখনো ভালো ফল বয়ে আনে না।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর গ্রেফতার হন বঙ্গবন্ধুর আজীবন সহযোগী তাজউদ্দীন আহমদ। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর জেলখানায় অন্য তিন রাজনৈতিক সহকর্মীর সঙ্গে নৃশংসভাবে খুন করা হয় তাজউদ্দীন আহমদকে।[12]

৩। তাজউদ্দীনের সমাজ ভাবনা ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উত্তরণ

তাজউদ্দীন আহমদের সমাজ ভাবনার মূলে ছিল বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক, মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন, শোষণমুক্ত, ন্যায়বিচারভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা। যৌক্তিক, পরমতসহিষ্ণু, উদার, গণতান্ত্রিক, চিন্তাশীল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের মাঝে তিনি তাঁর সেই স্বপ্নের ঐক্যবদ্ধ সমাজকে খুঁজেছেন। তিনি অনুধাবন করেন যে, সমাজের উন্নতি ও ব্যক্তির মনন-বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তিনি প্রচলিত ধারণাবৃত্ত ভেঙ্গে ইংরেজিসহ

[11] মোঃ হারুন অর রশিদ, "রাজনৈতিক কূটনৈতিক তাজউদ্দিন", মাহবুবুল করিম বাচ্চু(সম্পাঃ), তাজউদ্দিন আহমদ স্মৃতি এলবাম (ঢাকাঃ তাজউদ্দিন স্মৃতি পরিষদ, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ৬০।

[12] শুভ কিবরিয়া , জনগণের তাজউদ্দীন আহমদ, দৈনিক সমকাল, ২৩শে জুলাই ২০১০।

আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব অনুধাবন করেন। একই সাথে সমাজের সমন্বিত উন্নয়ন প্রচেষ্টার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলার তাগিদ দেন।[13] তিনি সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি করে কারিগরি- বৃত্তিমূলক ও জনকল্যাণমুখী শিক্ষাব্যবস্থার কথা বলেছেন।

প্রকৃতিনির্ভর কৃষিভিত্তিক এবং পশ্চাদপদ আবহমান বাংলার সমাজ জীবনের সমস্যা ও সম্ভাবনাকে তিনি যথার্থভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তিনি সমাজের ঐক্যবদ্ধ উন্নয়ন এর জন্য সমবায় ধারনার প্রবর্তণ করেন। তিনি কৃষকদের উন্নয়নের জন্য খাদ্য-সমিতি গঠন করেন। ফসলের মৌসুমে বিশেষত অবস্থাসম্পন্ন কৃষকের নিকট থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করে সংকটকালে তা বিতরণের ব্যবস্থা করেন। সাধারণভাবে এটি ধর্মগোলা নামে পরিচত হয়।[14]

দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার এবং আপোসহীন। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী গাজীপুরে গজারি বনের ব্যক্তিমালিকানার গাছ কাটতে হলেও এলাকার বন বিভাগের বৈধকরণ সীলগ্রহণ করতে হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে বন কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সুযোগমত ঘুষ গ্রহণ

[13] তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি, ১ জুন, ১৯৫০।

[14] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৪০

করত। তাজউদ্দীন আহমদ এর বিরুদ্ধে গনসচেতনতা আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু বন বিভাগের অসাধু কর্মচারীরা তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতি মামলা দায়ের করেন। ঘুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাকে জীবনের প্রথম হাজতবাস করতে হয়।[15] এ থেকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে বিচ্ছিন্নভাবে কোন আন্দোলন সম্ভব না, এতে ঘটনার পর ঘটনা জড়িয়ে আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়ে, অর্থাr আন্দোলন দলগতভাবে করতে হবে।

সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে সঠিকভাবে গড়ার অভিপ্রায়ে সার্বিক উন্নতির জন্যে সবসময় ভেবেছিলেন নির্ভুল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থার কথা, যা গণমানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তিনি যুদ্ধবিদ্ধস্থ দেশকে পুনঃগঠনের জন্য এরং সমৃদ্ধ ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮)প্রণয়ন করেন।[16] সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও উদার চিন্তার মানুষ হিসেবে বলেছিলেন- "বাংলাদেশ হবে একটি সম্পূর্ণ ধর্ম নিরেপেক্ষ রাষ্ট্র। এ দেশের নিরন্ন দুঃখী মানুষের জন্য রচিত হোক এক নতুন পৃথিবী। যেখানে মানুষ মানুষকে শোষণ করবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা হোক ক্ষুধা, রোগ, বেকারত্ব আর

[15] তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি, ১৯, নভেম্বর, ১৯৫০।

[16] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৫৩১।

অজ্ঞানতার অভিশপ্ত থেকে মুক্তি"।[17] রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণে তাজউদ্দীন আহমদের এই বক্তব্য হতে পারে আমাদের সবার দিকনির্দেশনা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি অতীতের আলোকে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনে বিধি-নিষেধ আরোপের প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার উচ্চারণ করেন। এই কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে ১৯৭২ সালের সংবিধাণে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগঠন নিষিদ্ধ হয়।[18]

৪। সুশাসন, নৈতিকতা ও তাজউদ্দীন আহমদ

উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে সুশাসন। সুশাসন নিশ্চিতকল্পে মূল প্রত্যয় হলো শাসন ব্যবস্থাকে জনকল্যাণমূলক কাজে নিয়োজিত করা। তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন দূরদর্শী ও দক্ষ রাষ্ট্রনায়ক। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশকে শত্রুমুক্ত করার কর্মযজ্ঞ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্বে তাজউদ্দীন আহমদ গড়ে তোলেন নিয়মিত ধরণের সুসমন্বিত একটি সরকার কাঠামো। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই সদ্য আত্মপ্রকাশকারী বাংলাদেশের জন্য নতুন সমাজ নির্মাণের সমস্যা ও সমাধানের বিষয় উপলব্ধি

[17] সুকান্ত পার্থিব, চাঁদের আলোয় ঢাকা সূর্যালোক তাজউদ্দীন আহমদ, available at http://blog.bdnews24.com/Sukanta/28030 accessed on 15 June, 2012

[18] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৫৪২

করেন। দূরদর্শী সেই উপলব্ধি থেকেই ড. মোজাফফর আহমদের সভাপতিত্বে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন।[19]

তাজউদ্দীন আহমদ রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়ার পিছনে ছিল কায়েমি স্বার্থের অবসান ঘটিয়ে গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার একটি মহান সংকল্প। তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি কোন অবস্থাতেই এই সংকল্প থেকে সরে আসেননি। শেখ মুজিবর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে ফিরে এলে তিনি প্রধানমন্ত্রী ভার তার উপর ছেড়ে দিয়ে মুজিবের একজন যোগ্য, সফল, গর্বিত সহকর্মীর পরিচয় দেন।

তাজউদ্দীন আহমদ একবার তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন, আমি এটাই দেখাতে চাই যে, একজন sr রাজনৈতিক কর্মী কোন রকমের অন্যায় বা কোন রকমের দুর্নীতি বা কোন রকমের স্বজনপ্রীতি তোষণবাদ করে না। শুধুমাত্র নিজের কাজ, নিজের চরিত্র এবং নিজের জনসংযোগের মাধ্যমে রাজনীতিতে সার্থক করে তোলে।

ব্যক্তিগতভাবে তাজউদ্দীন আহমদ খুবই উদারনীতির মানুষ ছিলেন। তাইতো মন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে নিজ এলাকায় গিয়ে বলেছিলেন, মনে রেখো, আমি শুধু এ এলাকার মন্ত্রী না, আমি

[19] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৫২।

পুরো বাংলাদেশের। এখন তোমাদের দায়িত্ব আগের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ পুরো দেশের মানুষ তোমাদের কাপাসিয়ার এই মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকবে। আমি স্বার্থপরের মতো আমার এলাকার উন্নয়নের কাজে হাত দিতে পারি না। আমাকে পুরো দেশে সব কিছু সমান ভাগ করে দিতে হবে।

তিনি স্বজনপ্রীতিকে প্রশ্রয় দিতেন না। তাইতো তিনি নিজ জেলা গাজীপুরের এসডিওকে বলতে পারেন, 'আমার কোনো আত্মীয়স্বজন পরিচয়ে কেউ যদি কোনো কাজের তদবির নিয়ে আপনার কাছে আসে এবং আপনি যদি মনে করেন কাজটি সঠিক, তারপরও কাজটি করবেন না।'[20]

বিবেকবান এই মানুষটি আত্মসমালোচনাতেও পিছপা নন, তিনি অকপটে দোষ-ত্রুটি স্বীকার করতেন। তাজউদ্দীন আহমদ বলতেন, 'আমরা দেশ শাসন করছি, দেশের মঙ্গল চাই, কাজেই আমাদের দুর্বলতা আছে, এগুলো মানা উচিত। স্বীকার করা উচিত। আমরা তো সব জানি না, তাই শিখতে হবে।'[21] বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় তাজউদ্দীন আহমদ যখন অর্থমন্ত্রী, তখন তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হামিদুল্লাহ সাহেবকে বলে দিয়েছিলেন, 'দেশের

[20] তাজউদ্দীন আহমদ: যুদ্ধদিনের কাণ্ডারী - সিমিন হোসেন রিমি, দৈনিক প্রথম আলো, ৩রা নভেম্বর ২০০৯।
[21] তাজউদ্দীন আহমদ আলোকের অন্তধারা, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : সিমিন হোসেন রিমি, প্রতিভাস, জুলাই ২০০৬।

অর্থনীতির ব্যাপারে প্রতিদিনের রিপোর্ট আমাকে এক দেড় পৃষ্ঠার মধ্যে টাইপ করে পাঠাবেন। যেন আমি পুরো চিত্র পাই। এখানে কোনো কিছু লুকানোর চেষ্টা করবেন না। কখনো আমার সন্তুষ্টির জন্য চেষ্টা করবেন না। সঠিক চিত্র পেলে আমি সংশোধন করার চেষ্টা করতে পারব।'[22]

মুক্তিযুদ্ধের সময় অন্য নেতারা পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকলেও তাজউদ্দীন আহমদ কাজের সুবিধার জন্য আলাদা থাকতেন। অফিসঘরের পাশের একটি কক্ষে ঘুমাতেন। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, 'অনেক মুক্তিযোদ্ধা শত্রুবাহিনীর হামলায় পা হারিয়েছেন, হাত হারিয়ে হাসপাতালে কাতরাচ্ছেন। কেউ গুলির আতঙ্কে যন্ত্রণা চেপে ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদেরও তো অনুভূতি আছে। তাঁদের মা বোন স্ত্রী ছেলেমেয়ে স্বজন রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কথা চিন্তা করার সময় কোথায়?'[23]

অর্থমন্ত্রী হিসেবে তিনি অনেক সময় নৈতিক সঙ্কটে পড়েন। স্বাধীনতা পরে তার কাছে একটি সরকারী ফাইল আসে। তাতে জরুরী ভিত্তিতে সার আমদানীর প্রস্তাব ছিল। সার আমদানী করা সত্যিই জরুরী ছিল। তবে এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, হাতে এখন সময় এত কম যে,

---

[22] তাজউদ্দীন আহমদ: যুদ্ধদিনের কাণ্ডারী - সিমিন হোসেন রিমি, দৈনিক প্রথম আলো, ৩রা নভেম্বর ২০০৯।

[23] সোহরাব হাসান, তাজউদ্দীন আহমদ ও জনগণের রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা, available at www.prothom-alo.com/detail/news/80809 accessed on 12 June, 2012

আন্তর্জাতিক টেন্ডার ডাকার সময় নেই, আগে সরবরাহ করেছে এমন এক বিদেশী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করা হোক। তখন তিনি বললেন, এমন প্রস্তাব মেনে নিলে দুর্নীতিকে উৎসাহিত করা হবে, না মানলে সারের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত হবে। আমি যাই করি তা অন্যায় হবে।[24]

তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন সুশাসনের প্রতীক। অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে গণকন্ঠ নামক একটি পত্রিকায় একই নাম্বারের দুটো টাকার নোট ছাপানো হয়, তখন বাজার সরব হয়ে ওঠে যে, ভারত বাংলাদেশে জাল মুদ্রা ছেপে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং কালোবাজারে সেসব টাকার মাধ্যমে জিনিসপত্র ক্রয় করে নিয়ে যাচ্ছে। তাজউদ্দীন এর তীব্র প্রতিক্রিয়া জানান, তিনি ভারতে ছাপানো সকল মুদ্রা ব্যাংক এ জমা দিয়ে বদলি টাকা নেয়ার জন্য দুই মাস সময় দেন। তখন এও বলেন যে, এধরণের নোট বাজারে ছাড়া হয়েছে, তার চেয়ে যদি বেশি টাকা জমা পড়ে তাহলে তিনি অর্থমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিবেন। কিন্তু সবশেষে হিসেব করে দেখা যায় যে, বরাদ্দকৃত মোট নোট থেকে ৫৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮শত ৪০ টাকা কম জমা পড়েছে।[25] তিনি গণকন্ঠ

[24] আনিসুজ্জামান, এক বিরল মানুষের কথা, পৃষ্ঠা ১৪।

[25] দৈনিক পূর্বদেশ, ৩ জুন, ১৯৭৩।

পত্রিকা নিকট কথিত দুটি নোট চেয়ে পাঠালে, তারা তা দেখাতে বা জমা দিতে ব্যর্থ হয়। মূলত, এটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের সাহায্যকারী ভারত এবং মুক্তিযুদ্ধের নেতাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার।[26]

তাজউদ্দীন আহমদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে অথবা জরুরি করণীয় বিষয়ে কখনো কাউকে ছাড় দেননি; এমনকি বঙ্গবন্ধুকেও নয়। তিনি আজীবন একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশের কথা বলেছেন , যার ভিত্তি হবে গণতন্ত্র। তাইতো গণতন্ত্রের বদলে একদলীয় বাকশাল শাসনব্যবস্থা চালু করতে দেখে তিনি বঙ্গবন্ধুকেও বলতে পারেন, "আপনি একদলীয় শাসনব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন, আমি আপনার এই একদলীয় শাসনের সঙ্গে একমত নই। আমি আর আপনি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগের ২৪-২৫টা বছর একসঙ্গে বাংলাদেশের এমন কোনো মাঠ-ময়দান নেই যেখানে যাইনি। আমরা বক্তৃতায় সবসময় বলেছি একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশের কথা, যার ভিত্তি হবে গণতন্ত্র। যে গণতন্ত্রের গুণগান করেছি আমরা সবসময়, আজকে আপনি একটি কলমের খোঁচায় সেই গণতন্ত্রকে শেষ করে দিয়ে দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা করতে যাচ্ছেন। আপনার এই সিদ্ধান্তে আমি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করছি"।

[26] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৫৭১

তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করেন ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর। মূলত তিনি অনেক বিষয়েই সরকারের অনুসৃত নীতি সমর্থন করতেন না। এমতাবস্থায় তিনি সরকার থেকে সরে আসার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বস্তুত তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে শেখ মুজিবের আহবানের অপেক্ষায় থাকেন। এ ক্ষেত্রেও তার হৃদয়ের উদারতা ও দেশাত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়, কেননা নিজে পদত্যাগ করলে সরকারের দূর্বলতার বিষয়টি প্রাধান্য পায়।[27]

ব্যতিক্রমী এই মানুষটি তাঁর দীর্ঘ ৫০ বছরের সংগ্রামী রাজনৈতিক জীবনে কাজ-কর্মে নিজ কৃতিত্বের কথা কখনো ভাবতেন না, নীরবে কাজ করে যেতেন আপন কর্তব্যজ্ঞানে। সেজন্য হয়তো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাঁর সহকর্মীদের বলতেন, "আসুন, আমরা এমনভাবে কাজ করি ভবিষ্যতে যখন ঐতিহাসিকেরা বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করবে তখন যেন আমাদের খুঁজে পেতে কষ্ট হয়"। গৌরবোজ্জ্বল কর্মময় জীবনে কোনো কাজেই তাজউদ্দীন দাবি করেননি নিজের কৃতিত্ব। বাংলা মাকে গভীরভাবে ভালোবেসে বলেছিলেন- 'মুছে যাক আমার নাম কিন্তু

[27] কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর, পৃষ্ঠা ৫৭৭

বেঁচে থাক বাংলাদেশ'। এভাবেই আত্মঅহংকার বিসর্জন দিয়ে সবসময় কর্তব্য বিবেচনা করে নিঃস্বার্থভাবে, একাগ্রচিত্তে কাজ করে গেছেন জীবনের শেষ দিন অবধি।

৫। উপসংহার

তাজউদ্দীন আহমদ তাঁর সততা, আন্তরিকতা, গণতান্ত্রিক চেতনা ও মানবতাবোধের মধ্যদিয়ে নিজেকে সমাজের একজন অগ্রগামী মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনময় আমরা তাকে খুঁজে পাই বিরল প্রজ্ঞাবান , sr, সাহসি, নিষ্ঠাবান, নিয়মানুবর্তি, আদর্শবান ও অনাড়ম্বর একজন মানুষ হিসেবে। তাইতো ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে তাকে নিয়ে লেখা হয় নিবন্ধ।[28] কিন্তু তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন প্রচারবিমুখ মানুষ। এ ব্যাপারে তার মধ্যে এক প্রকার উদার অহংবোধ কাজ করত। ফলে, জাতি তাঁর মত একজন মহান মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তা এবং কর্মময় জীবনের অনেক বিষয় অবগত নয়। চিন্তাবিদ অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমের ভাষায় বলতে হয়, 'তাঁকে জানতে এখনো আমাদের অনেক বাকি'।[29]

বস্তুত তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের ইতিহাসে বিয়োগান্ত উপাখ্যানের নায়ক। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্থপতি। অথচ বাংলার ইতিহাসের পাতায় তাঁর স্থান

[28] তাজউদ্দীন আহমদ জেল হত্যা এবং ইতিহাসের দায় - শুভ কিবরিয়া সাপলুডু, পৌষ সংখ্যা ১৪১৮ available at www.facebook.com/note.php?note_id=378998478783126 accessed on 10 June, 2012

[29] বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জি.এম. তারিকুল ইসলাম দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জুলাই ২০০৯ইং।

সামান্যই। ইতিহাসের এই কলংকময়তার মাঝে তিনি বেঁচে আছেন মানুষের মনের মনিকোঠায়। আজও আমরা তাই তাজউদ্দীন আহমদের মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পাই বাংলাদেশের gvbwP‡Î। তাঁর নেতৃত্বের যোগ্যতা, উন্নয়ন ভাবনা, দেশপ্রেম, নীতির প্রতি অবিচলতা সর্বোপরি মানবীয় গুণাবলি পরবর্তী প্রজন্মের মানুষদের স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত করবে।

সহায়ক রচনাপঞ্জিঃ

পুস্তকসমূহঃ

১। কামাল হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদঃ বাংলাদেশের অভূদ্যয় এবং তারপর(অংকুর প্রকাশনী, ২০০৮)।

২। কামরুদ্দীন আহমেদ, পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি (ঢাকাঃ ইনসাইড লাইব্রেরী, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ)।

৩। তাজউদ্দীন আহমেদের ডায়রী।

৪। মঈদুল হাসান, মূলধারা '৭১ ।

৫। মুক্তিযুদ্ধ পূর্বাপর কথোপকথন, প্রথমা, ২০০৯।

৬। মোঃ হারুন অর রশিদ, "রাজনৈতিক কূটনৈতিক তাজউদ্দিন", মাহবুবুল করিম বাচ্চু(সম্পাঃ), তাজউদ্দিন আহমদ স্মৃতি এলবাম (ঢাকাঃ তাজউদ্দিন স্মৃতি পরিষদ, ১৯৯৭)।

৭। তাজউদ্দীন আহমদ আলোকের অন্তধারা, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা : সিমিন হোসেন রিমি, প্রতিভাস, জুলাই ২০০৬।

৮। আনিসুজ্জামান, এক বিরল মানুষের কথা ।

৯। আত্মকথা ৭১ নির্মলেন্দু গুণ।

১০। আবদুল গাফফার চৌধুরী, ইতিহাসের রক্তপলাশ পনেরই আগস্ট পঁচাত্তর, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

প্রামাণ্যচিত্র

১। তানভীর মোকাম্মেল, তাজউদ্দিন আহমেদ : নি:সঙ্গ সারথি (২০০৭)।

ইন্টারনেট

১। সুকান্ত পার্থিব, চাঁদের আলোয় ঢাকা সূর্যালোক তাজউদ্দীন আহমদ, available at http://blog.bdnews24.com/Sukanta/28030

২। সোহরাব হাসান, তাজউদ্দীন আহমদ ও জনগণের রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা, available at www.prothom-alo.com/detail/news/80809

৩। তাজউদ্দীন আহমদ জেল হত্যা এবং ইতিহাসের দায় - শুভ কিবরিয়া সাপলুডু, পৌষ সংখ্যা ১৪১৮ available at www.facebook.com/note.php?note_id=378998478783126

প্রবন্ধ

১। জি. এম. তারিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ জুলাই ২০০৯ইং।

২। শুভ কিবরিয়া , জনগণের তাজউদ্দীন আহমদ, দৈনিক সমকাল, ২৩শে জুলাই ২০১০।

৩। তাজউদ্দীন আহমদ: যুদ্ধদিনের কাণ্ডারী - সিমিন হোসেন রিমি, দৈনিক প্রথম আলো, ৩রা নভেম্বর ২০০৯।

৪। তাজউদ্দীন আহমদ জেল হত্যা এবং ইতিহাসের দায় - শুভ কিবরিয়া সাপলুডু, পৌষ সংখ্যা ১৪১৮।